সৈয়দ বোরহান কবীর

আরেক যুদ্ধের অপেক্ষায় বাংলাদেশ

বাংলাদেশে এখন আরেক যুদ্ধের প্রস্তুতি চলছে। যুদ্ধের অবয়ব এখন চূড়ান্ত হয়ে গেছে। বাতাসে কান পাতলেই শোনা যাচ্ছে যুদ্ধের চূড়ান্ত প্রস্তুতি পর্ব। এই যুদ্ধের ধামামা ইতিমধ্যে বাজতে শুরু করেছে। এই যুদ্ধের মাধ্যমেই স্থির হবে, আমরা স্বাধীন গণতান্ত্রিক একটি রাষ্ট্র হিসেবে বেঁচে থাকতে পারবো কিনা। এই যুদ্ধের মাধ্যমেই স্থির হবে বাংলাদেশ কি পাকিস্তানের মতো একটি ব্যর্থ, জঙ্গী এবং সন্ত্রাসী রাষ্ট্র হবে নাকি শান্তি সম্প্রীতির এক উদাহরণ হবে। এই যুদ্ধটা আসন্ন, আমরা চাই বা নাই এই যুদ্ধ শুরু হচ্ছে।

বাঙালী জাতিই বিশ্বে একমাত্র জাতি যারা শান্তির জন্য, অধিকার আদায়ের জন্য যুদ্ধ করেছে। যুদ্ধটা আমাদের উপর চাপিয়ে দেয়া হয়েছিল। ৭০ এর নির্বাচনে এদেশের মানুষ তাদের আকাংখার পক্ষে ভোট দেয়, ৬ দফার পক্ষে ভোট দেয়। কিন্তু পাকিস্থানী জান্তারা এটা মেনে নিতে পারেনি। বাঙালীর হাতে তারা পাকিস্থানের মসনদ তুলে দিতে চায়নি। তাই তারা পাশবিক এবং পৈশাচিক কায়দায় বাঙালীর স্বপ্ন, বাঙালীর অধিকারকে কবর দিতে চেয়েছে। অপারেশন সার্চ লাইটের নামে নির্বিচারে হত্যা করেছে নিরীহ বাঙালীদের। শান্তিকামী এদেশের মানুষ শান্তির জন্য সেদিন অস্ত্র হাতে তুলে নিয়েছিল। আমাদের মুক্তিযুদ্ধের স্বপ্ন ছিল শান্তি, সম্প্রীতি এবং বৈষম্যহীন এক অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ। বার বার এ অঞ্চলের মানুষ এর পক্ষে কথা বলেছে। কিন্তু সবসময়ই এর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র হয়েছে। শান্তির বদলে সন্ত্রাস চাপিয়ে দেয়া হয়েছে। এখনও আবার চারিদিকে সন্ত্রাসের বিষবাষ্প। ৭১ এর মুক্তিযুদ্ধের মধ্যে দিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয় এক অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ। গণতান্ত্রিক চেতনায় বৈষম্যহীন এক সমাজের স্বপ্ন দেখি আমরা। কিন্তু এই স্বপ্ন ভূমিষ্ঠ হবার সাথে সাথেই হোঁচট খায়। ৭৫ এর ১৫ আগষ্ট আরেকটি যুদ্ধে জয়ী হয় স্বাধীনতা বিরোধী শক্তি। বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধের চেতনার উল্টো পথে হাঁটতে শুরু করে। আবার শুরু হয় ধর্মভিত্তিক রাজনীতি। স্বাধীনতা বিরোধি শক্তি আবার সংঘবদ্ধ হয়। আর ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য ক্ষমতালিপ্সুরা হাত মেলায় স্বাধীনতা বিরোধি শক্তির সাথে। স্বাধীনতা বিরোধি রাজাকার, আলবদর এবং তাদের দোসররা মূলধারার রাজনীতিতে প্রবেশ করে। 'পাকিস্থানী হানাদার বাহিনী' নিষিদ্ধ হয় গণমাধ্যমে। মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বিকৃতি করে কলংকিত করা হয় গোটা জাতিকে। ৭৫ থেকে ৯০ দীর্ঘ ১৫ বছরের অগণতান্ত্রিক, স্বৈরাচারী শাসনামলে স্বাধীনতা বিরোধী শক্তিকে শুধু রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতাই দেয়া হয়নি, তাদের অর্থনৈতিক ক্ষমতাকেও বৃদ্ধি করা হয়েছে। এরা সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিকভাবে ক্ষমতাবান হয়েছেন। ৯১-এ যখন দীর্ঘ স্বৈরশাসনের অবসানের পর একটি অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে একটি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা কায়েম হয়, তখন স্বাধীনতা বিরোধি গোষ্ঠী হয়ে ওঠে ক্ষমতায় যাবার ট্রামকার্ড। দীর্ঘ ১৫ বছর স্বাধীনতা বিরোধি শক্তি রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা পেয়ে এমন এক অবস্থানে চলে যায় যে, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা লাভের ক্ষেত্রে তারা হয়ে ওঠে একটা ফ্যাক্টর। ১৯৯১-এ জামাতের সমর্থন নিয়ে বিএনপি সরকার গঠন করে। আর আওয়ামী লীগ সমর্থিত রাষ্ট্রপতি প্রার্থী বিচারপতি বদরুল হায়দার চৌধুরী স্বাধীনতা বিরোধীদের মদদ নিতে ধর্না দেন যুদ্ধাপরাধী গোলাম আজমের বাড়ীতে। ১৯৯১-এ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা বাংলাদেশে কায়েম হবার পর, দেশের পরিস্থিতি এমন দাড়ায় যে, জামাতের সমর্থন ছাড়া রাষ্ট্রক্ষমতায় যাওয়া যাবে না।

এভাবে জামাত ২০২১ সালের মধ্যে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করে বাংলাদেশকে একটি 'পাকিস্থান' বানানোর নীলনক্সা প্রণয়ন করে। কিন্তু জামাতের এই সুখের স্বপ্নে বাধ সাধেন ৭১ এর শহীদ পরিবাররা, মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাসী কিছু অগ্রসর মানুষ। যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবি তোলেন তারা। গঠিত হয় ৭১ এর ঘাতক নির্মূল জাতীয় সমন্বয় কমিটি। শহীদ জননী জাহানারা ইমাম। শহীদ রুমীর মা। অনেক বীর মুক্তিযোদ্ধার প্রিয় খালাম্মা। এক সর্বনাশা সময়ে ডাক দেন আরেক যুদ্ধের। দাবি তোলেন ঘাতকদের বিচারের। ৭৫ এর পর প্রথম স্বাধীনতা বিরোধী, সাম্প্রদায়িক এবং ধর্মান্ধ গোষ্ঠীর নেতৃত্বকে চ্যালেঞ্জ করা হয়। শহীদ জননীর নেতৃত্বে সমবেত হন মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাসী সকল মুক্তিকামী মানুষ। কিন্তু স্বাধীনতা বিরোধীদের শেকড় তখন ইতিমধ্যে অনেক গভীরে প্রথিত হয়েছে। ক্ষমতার ভারসাম্যে তারা। বিএনপি তাদের হারালে রাষ্ট্রক্ষমতা হারাবে– এই আতংকে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবিকে পাশ কাটিয়ে যায়। অন্যদিকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার দল বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ, ঘাতক-দালাল নির্মূল কমিটিতে সক্রিয় থাকলেও সংসদে জামাতের সাথে সহঅবস্থান করতে থাকে। আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় যাবার আকাংখায় স্বাধীনতা বিরোধীদের বিরুদ্ধে সরাসরি শক্ত অবস্থান নিতে ব্যর্থ হয়। বরং কৌশলগতভাবে তারা বিএনপিকে জামাত থেকে বিচ্ছিন্ন করে। এই অবস্থায় নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনে আওয়ামী লীগ দীর্ঘ ২১ বছর পর আবার দেশ পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করে। কিন্তু রাজনৈতিক জটিল অংকের হিসেব নিকেশে আওয়ামী লীগ স্বাধীনতা বিরোধী শক্তির বিরুদ্ধে কিছুই করতে পারেনি।

কিন্তু, স্বাধীনতা বিরোধি শক্তিদের হিসেব ছিল অন্য। তারা দেখে ২১ বছর পর মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের একটি রাজনৈতিক দল ক্ষমতায় এসেই মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে কথা বলা শুরু করেছে। মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে এক সাংস্কৃতিক আবহ তৈরি হয়। সঠিক ইতিহাস জানার পথ জাতির সামনে উন্মুক্ত হয়। বিশেষ করে তরুণ প্রজন্ম জানতে থাকে মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস। আর ধর্মান্ধ মৌলবাদী গোষ্ঠীর কাছে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা সব সময়ই অপছন্দের। কারণ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা হলো মত প্রকাশের, সুস্থ বিতর্কের এবং বহুমত ব্যবস্থার। এরকম একটি মুক্ত চিন্তা ব্যবস্থায় মৌলবাদের মৃত্যু হয়, প্রগতি এবং যুক্তিবাদের বিজয় হয়। এটা বুঝতে পেরেই স্বাধীনতা বিরোধি চক্র এ নতুন চক্রান্ত শুরু করে। সন্ত্রাস এবং পেশী শক্তি দিয়ে তারা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে ধ্বংস করার এক নীলনক্সা প্রণয়ন করে। এই নীলনক্সার অংশ হিসেবেই তারা তৈরি করে এক জঙ্গী ইউনিট। আওয়ামী লীগ শাসনামলের শেষ দিকেই এই জঙ্গীদের সংগঠিত করে স্বাধীনতা বিরোধি গোষ্ঠি। প্রত্যন্ত অঞ্চলে মাদ্রাসা শিক্ষার নামে এরা শুরু করে সশস্ত্র প্রশিক্ষণ। আওয়ামী লীগ শাসনামলেই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে এরা শুরু করে জঙ্গী আক্রমণ। উদীচির সম্মেলনে বোমা হামলা, পহেলা বৈশাখে রমনা বটমূলে বোমা হামলার মতো ঘটনা ঘটায় এরা। পাশাপাশি স্বাধীনতা বিরোধি গোষ্ঠী মূলধারার রাজনীতির সঙ্গেও গাটছাড়া বাধে। তারা বুঝতে পারে, একক শক্তিতে চলার মতো অবস্থা তাদের নেই। এ সময় আওয়ামী লীগের মোকাবেলা করতে বিএনপিও জামাতের দিকে হাত বাড়ায়। গড়ে ওঠে বিএনপি-জামাত ঐক্য। বাংলাদেশে ভোটের রাজনীতির জটিল সমীকরণে একঘরে আওয়ামী লীগ ৪০ শতাংশের বেশী ভোট পেলেও ২০০১ এর নির্বাচনে পরাজিত হয় দারুন ভাবে। এবার স্বাধীনতা বিরোধীরা তাদের স্বরূপে ফিরে আসে। এক দিকে তাদের সশস্ত্র সংগঠন দিয়ে তারা সারাদেশে সন্ত্রাসবাদ এবং জঙ্গীবাদ কায়েম করতে চায়। অন্যদিকে রাষ্ট্রক্ষমতায় বিএনপিকে লুটপাটের সুযোগ দিয়ে তারা প্রশসন, আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে দখল করে ফেলে। ২০০১ থেকে ২০০৬ পর্যন্ত সিভিল এবং মিলিটারী প্রশাসনে ব্যাপক জামাতীকরণ ঘটে। ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও তারা গড়ে শক্তিশালী ভিত। সারাদেশকে একরকম ঘিরে ফেলে স্বাধীনতা বিরোধি চক্ররা। তাদের সৃষ্ট বাংলা ভাইরা একদিকে কায়েম করে তাদের রাজত্ব, অন্যদিকে রাষ্ট্রক্ষমতার মূল চালিকা শক্তি হয় তারা। এরকম পরিস্থিতিতে বিএনপি-জামাত আরো এক মেয়াদে যে কোন মূল্যে ক্ষমতায় থাকতে মরিয়া হয়ে ওঠে। এ জন্য তত্ত্বাবধায়ক সরকার কাঠামোর নিরপেক্ষতার বর্ম তারা উপড়ে ফেলে। দলীয় পছন্দের ব্যক্তিকে তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রধান করতে তারা সংবিধান সংশোধন করে। অক্টোবরে আন্দোলনের মুখে বিএনপির অনুগত রাষ্ট্রপতি ড. ইয়াজউদ্দিন আহামদ নিজেকে তত্ত্বাবধায়ক প্রধান হিসাবে ঘোষণা করেন। বিএনপি-জামাত জোটের ক্ষমতায় থাকার মরিয়া প্রচেষ্টার কারণে সৃষ্টি হয় ওয়ান-ইলেভেন। ওয়ান-ইলেভেনের পর কতগুলো বিষয় মানুষের সামনে স্পষ্ট হয়। এর একটি হলো প্রশাসনকে স্বাধীনতা বিরোধি শক্তি গ্রাস করে ফেলেছে। এ সময় আবার যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবি সামনে চলে আসে। পনেরো বছরের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় গড়ে ওঠা তরুণ প্রজন্মের কাছে স্বাধীনতা বিরোধিদের বিচারের প্রশ্নটিই হয়ে ওঠে মুখ্য। আবার মুক্তিযুদ্ধের ডাক দেন সেক্টর কমান্ডারস ফোরাম। যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবিতে সারাদেশে শুরু হয় এক অনন্য জাগরণ। এরকম পরিস্থিতিতে, জাতীয়-আন্তর্জাতিক চাপে ওয়ান-ইলেভেনের মাধ্যমে গঠিত অনির্বাচিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার একটি অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের পথে এগুতে থাকেন। তারা দুই নেত্রীকে মুক্ত করে রাজনৈতিক সমঝোতার পথ তৈরী করেন। এবার নির্বাচনে আওয়ামী লীগ আর ভুল করেনি। যে আওয়ামী লীগ ভোটের জন্য মৌলবাদী গোষ্ঠীর সংগে চার দফা চুক্তি করে, সেই আওয়ামী লীগ তাদের দিনবদলের নির্বাচনী ইশতেহারে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের অঙ্গীকার ঘোষণা করে। ডিসেম্বর মাস হলো বিজয়ের মাস। এই বিজয়ের মাসে গণমাধ্যম মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে যতো কথা বলে, ততো কোনঠাসা হয়ে পড়ে স্বাধীনতা বিরোধি গোষ্ঠী। অবশেষে ২৯ ডিসেম্বরের নির্বাচনে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার পক্ষে নিরঙ্কুশ গণরায় পাওয়া যায়। তিন-চতুর্থাংশের বেশী আসন পেয়ে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন মহাজোট সরকার দেশ পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করে।

এবারের নির্বাচনের তাৎপর্যপূর্ণ দিক হলো, স্বাধীনতা বিরোধি শক্তির বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট গণরায়। এই নির্বাচনের পর যুদ্ধাপরাধীদের বিচার ছাড়া আওয়ামী লীগের সামনে কোন পথ খোলা নেই। এই বিচার প্রক্রিয়া দ্রুতই শুরু করা উচিত ছিল আওয়ামী লীগের। কিন্তু আওয়ামী লীগ সম্ভবত বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার রায় কার্যকর করার আগে এই বিষয়টিতে হাত দিতে চায়নি। যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের প্রশ্নে যে এখন জাতীয় ঐক্যমত তৈরী হয়েছে এটা স্বাধীনতা বিরোধী জামাত শিবির গোষ্ঠীরও অজানা নয়। তাই তারা এই সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকেই শুরু করেছে সন্ত্রাস, জঙ্গী তৎপরতা। সারা দেশে অরাজক এবং একটি বিশৃংখল অবস্থা সৃষ্টির জন্য একের পর এক ঘটানো হচ্ছে ঘটনা। বিডিআর বিদ্রোহ থেকে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে সহিংসতা, খাগড়াছড়িতে সন্ত্রাস– সব ঘটনার গভীরে গেলেই পাওয়া যাবে জামাতের লেজ। দেশে সন্ত্রাস, সহিংসতার মাধ্যমে একটা অরাজক পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে পারলেই যুদ্ধাপরাধীদের বিচার ঠেকানো যাবে– এই চিন্তা থেকেই স্বাধীনতা বিরোধি গোষ্ঠী এগুচ্ছে। তাই যুদ্ধ আজ আসন্ন। এই যুদ্ধ আমাদের অস্তীত্বের যুদ্ধ। এ যুদ্ধে আমাদের হারার কোন পথ নেই।

নির্বাহী পরিচালক, পরিপ্রেক্ষিত
ই-মেইলঃ poriprekkhit@yahoo.com